প্রথম আলো বাংলাদেশ

কপোট্রনিক অবতার: অটিস্টিকদের মানসিক বিকাশ

এহসান হক | আপডেট: ০০:০৫, নভেম্বর ০৮, ২০১৩ | প্রিন্ট সংস্করণ



২০১১ সাল। এস্পারগার অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ডের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি—এমআইটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত ছিলাম আমি।
উদ্বোধনের একটু পরেই এল আমার কথা বলার পালা। মঞ্চে উঠেই শুরু করলাম আমার গতানুগতিক ধারার বক্তব্য। হাত-পা নেড়ে খুব উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করলাম, 'আমরা চাই কম্পিউটার মানুষের মতো বুদ্ধিমান হোক। আমরা যেমন একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারি, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করতে পারি, একদিন যন্ত্রের সঙ্গেও আমরা ঠিক একই কাজ করতে পারব। ছেলেবেলার সেই রঙিন সায়েন্স ফিকশন বাস্তবে পরিণত হতে আর বেশি দেরি নেই।'
বক্তৃতা শেষ করতেই বেশ কয়েকজন হাত তুললেন। আমি তো খুশিতে বাগবাগ, ভাবছি, এখনই এসে কাজের প্রশংসা করবে। বুকটা ফুলিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ বলুন।'
একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ কাছে এসে বললেন, 'দেখো, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমি নার্ভাস হয়ে যাই, বুকটা ধড়ফড় করে। চোখের পরিবর্তে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকি। অনেক সময় কথা বলা শুরু করলে বুঝতে পারি না যে অনেক বেশি কথা বলছি। তাই হয়তো পরিচিত লোকজন আমাকে দেখে কাজের ভান করে পালিয়ে যান। পেছনে পেছনে বলে বাচাল, আবার কখনো অসামাজিক।

আমার খুব ইচ্ছা, আমার এই অভ্যাসটুকু বদলাব, যাতে মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারি, সহজেই সবার বন্ধু হতে পারি। কিন্তু কার কাছে সাহায্য চাইব? অন্য কারও কাছে সাহায্য চাইতেও লজ্জা বোধ হয়।'

তোমরা সায়েন্স ফিকশনকে বাস্তবতায় পরিণত করার চেষ্টা করছ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (এআই) সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, সেটা খুবই চমৎকার। কিন্তু সেই সঙ্গে কি তোমাদের এই প্রযুক্তি আমাদের কোনো কাজে আসতে পারে? বিজ্ঞান যদি মানুষের কাজে না আসে, তাহলে

সেই বিজ্ঞান দিয়ে আমার কী লাভ? ফুলে থাকা বুকের ছাতি নিচে নেমে আসে। লজ্জায় মাথা নত করে বললাম, 'আপনাদের মতামতের জন্য ধন্যবাদ।'

বাসায় এসে অনেক চিন্তা করলাম। কী করা যেতে পারে? এত কঠিন কঠিন সমীকরণ সমাধান করে কী লাভ, যদি সেগুলো মানুষের কাজে না লাগে?

চিন্তা করে ঠিক করলাম, বানাব একটা কম্পিউটার 'অবতার' (অ্যাভাটার)। এখানে ছোট্ট করে বলে রাখি, অবতার মানে হচ্ছে কম্পিউটারে একটা কার্টুন, যা কিনা দেখতে অবিকল মানুষের মতো এবং কথাবার্তাও ঠিক মানুষের মতন। প্রশ্ন হচ্ছে, কম্পিউটারের ভেতর বসে থাকা একটা কার্টুন কম্পিউটারের বাইরের জগতের কাউকে কেমন করে চিনবে, জানবে বা শুনবে? কিংবা এটা করেই মানুষের কী লাভ?

যেমন ধরুন এস্পারগার সিনড্রোমের কথা, এই সিনড্রোমে মানুষ অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তিতে ভোগে, তাই সবার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। অন্তরালে হয়তো সবাই বলে, 'দেখেছ, লোকটা কত অদ্ভুত?' কিন্তু বাস্তবে, এদের অনেকেই বেশ সামাজিক এবং বন্ধুসুলভ, অনেকেই মানুষের সংস্পর্শে আসতে আগ্রহী, কিন্তু জানে না কী করে সাহায্য পেতে পারে।

ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই—ক্লাসরুমের ভেতর মাথাভর্তি প্রশ্ন কিলবিল করা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই প্রশ্ন করতে ভয় পাই বা ইতস্তত বোধ করি। ভাবি, প্রশ্নটা যে করব লোকে কী ভাববে? শিক্ষক খেপে গিয়ে আমাকে অপমান করবেন না তো? 'পাছে লোকে কিছু বলে' মনোভাব নিয়ে আমরা অনেক সময়ই অনেক ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে অনুৎসাহী হই।

কম্পিউটারের সঙ্গে অনুশীলন করার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুশীলন করলেও কম্পিউটার কখনো বিরক্ত হবে না, কম্পিউটারকে একই প্রশ্ন বারবার করলেও তার গলার স্বর কখনো উঁচু হবে না, ভ্রুতে ভাঁজ পড়বে না। শুধু তা-ই নয়, কথোপকথনের ব্যাপারে সাহায্য করতে হলে, কম্পিউটারের পক্ষে আমাদের মুখাবয়ব, কথা, কণ্ঠ, গলার স্বর, ভাবভঙ্গি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া সম্ভব, যেটা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব না।

যেই ভাবা, সেই কাজ। কাজের মধ্যে ঘটতে লাগল নানান বিপত্তি। যেমন ধরুন আমাদের মুখের ভেতর আছে ৪৩টা মাংসপেশি। এই ৪৩টা পেশি দিয়ে যেকোনো সময় আমাদের পক্ষে ১০ হাজারেরও বেশি অঙ্গভঙ্গি করা সম্ভব। এই ভঙ্গিগুলো কি কম্পিউটারের পক্ষে শনাক্ত করা সম্ভব? তারপর ধরুন, মানুষের কথার মধ্যে রয়েছে অনেক রকমের বৈচিত্র্য। বরিশালের মানুষের কথা বলার ভঙ্গি চট্টগ্রামের মানুষদের তুলনায় বেশ ভিন্ন। একটা যন্ত্রের পক্ষে কি এই বৈচিত্র্য চেনা পারা সম্ভব? প্রায় এক বছর গাধার মতো খেটে প্রযুক্তিগতভাবে সামান্য উৎকর্ষ সাধন করে কিছু একটা দাঁড় করালাম। বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠকেরা আমার গবেষণাপত্র পড়তে পারেন।

শেষে একটা অবতার তৈরি হলো, যে কিনা ওয়েবক্যাম দিয়ে মানুষের মুখাবয়ব বিশ্লেষণ করতে পারছে, মানুষটি হাসলে, অবতারটিও হেসে উঠছে। মানুষ কথা বলা শুরু করলে মানুষের কথাগুলো বুঝতে পারছে, প্রয়োজনে দরকারি জায়গাগুলোতে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি প্রকাশ করছে। যদিও আরও অনেক কাজ বাকি, আমি খুশি যে কোনো মতে কিছু একটা দাঁড় করানো গেছে। এখন সবচেয়ে কঠিন কাজ, এই প্রযুক্তিটি মূল্যায়ন করে দেখাতে হবে যে এতে মানুষের উপকার হচ্ছে।

মূল্যায়নের প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করলাম চাকরির সাক্ষাৎকার। গবেষণায় দেখা গেছে যে শিক্ষাগত বৃত্তান্তের ওপর ভিত্তি করে মানুষকে চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। কিন্তু চাকরির সাক্ষাৎকারে তার ব্যবহার এবং পারস্পরিক আচরণের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঠিক করলাম, অবতারটি চাকরির সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করবে, আর প্রশ্ন করে যাবে। সাক্ষাৎকার শেষে দেখাবে পুরো সময়টি প্রার্থী কী করেছিল, কোথায় কতখানি হেসেছিল, কথাগুলো কত দ্রুত বলেছে, কথার মাঝে, 'ইয়ে মানে...,' 'যেটা বলতে চেয়েছিলাম...,' 'জিনিসটা হলো...সেই আরকি,' এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় কথা কতবার বলেছেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই প্রযুক্তির ব্যবহারকারী হিসেবে বাছাই করলাম। অর্ধেকের মতো ছাত্রছাত্রী আমাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করল, আর বাকি অর্ধেক চাকরির সাক্ষাৎকারে কী করা উচিত বা অনুচিত তার ওপর ভিডিও দেখল।

গবেষণাটি করে তথ্য বিশ্লেষণ করে চক্ষু চড়কগাছ! রীতিমতো কালঘাম ছোটা শুরু করল। দৌড়ে গেলাম আমার পিএইচডি সুপারভাইজার অধ্যাপক রোজালিন্ড পিকার্ডের অফিসে। তিনি আমার বিশ্লেষণ দেখে, পিঠে একটা থাবা দিয়ে বললেন, 'আমি ১৫ বছর ধরে যে সমস্যাটির সমাধান করতে চেয়েছিলাম, তুমি তোমার পিএইচডির গবেষণার মাধ্যমে তার সমাধান করলে। তুমিই প্রথম দেখালে যে যন্ত্রের সঙ্গে অনুশীলন করে মানুষের পক্ষে তার পারস্পরিক ব্যবহারের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।'

আমি খুশি হলেও মনে মনে বুঝে নিলাম, আমি তাঁর ছাত্র দেখে একটু বেশি বেশি করে বলছেন। কোনো রকমে কাজগুলোর ফলাফল লিখে, পাঠিয়ে দিলাম 'উবিকুইটাস কম্পুউটিই' নামের এক সম্মেলনে। এতে পৃথিবীর বাঘা বাঘা গবেষকেরা আমার কাজের ফলাফল যাচাই করতে পারবেন। সম্মেলনের এক সপ্তাহ আগে একটা ই-মেইল পেয়ে চোখ আবার কপালে উঠল! প্রায় ৪০০টি গবেষণাপত্রের মধ্যে আমার কাজটিকে সে বছর শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সম্মেলনের প্রধান ব্যক্তিগত ই-মেইলে বলেছেন, 'তুমি শুধু বিজ্ঞানকেই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওনি, পাশাপাশি বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক আচরণকে উন্নত করার একটি নতুন সম্ভাবনাকে সামনে তুলে এনেছ। আমরা আশা করছি, তোমার এই কাজের মাধ্যমে অন্য গবেষকেরাও এই ধরনের কাজ করতে আগ্রহী হবেন।'

সম্মেলনের কয়েক দিন পরেই ছিল এস্পারগার অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ডের

সমাবর্তন অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এবারও আমি আমন্ত্রিত অতিথি।

হঠাৎ করেই দেখা হলো পুরোনো সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে, যিনি আমাকে এক বছর আগে মানুষের উপকারে আসে এমন গবেষণা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কাছে গিয়ে পরিচয় দিয়ে ধন্যবাদ জানালাম তাঁর উপদেশের জন্য। খুলে বললাম, তাঁর মতামত কী করে আমার পিএইচডির গবেষণাকে প্রভাবিত করেছে? ভদ্রলোকটির অন্য কারোর চোখে চোখ মেলাতে কষ্ট হয়। তার পরেও, কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে চোখের দিকে তাকিয়ে হাতটা জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু বললেন না।

ইংরেজি থেকে অনূদিত

এহসান হক

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব রচেস্টারের কম্পিউটার বিজ্ঞানের সহকারি অধ্যাপক এহসান হক। ২০১৩ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মিডিয়া ল্যাব থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। মানুষ এবং যন্ত্রের সম্পর্ককে বাস্তবে রূপ দেওয়ার বিষয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। একটি রোবট মানুষের ভাষা, মুখভঙ্গি, ইশারা ইত্যাদি বুঝে তার সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে, এমন গবেষণায় সফলতা পেয়েছেন এহসান হক। তাঁর গবেষণা অটিস্টিক ব্যক্তিদের চিকিৎসায় কাজে লাগবে। তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধ আইইইই, এসিএমের বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে ছাপা হয়েছে।

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
প্রথম আলো ১৯৯৮-২০১৩

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ৮১৮০০৭৮-৮১, ফ্যাক্সঃ ৯১৩০৪৯৬, ই-মেইলঃ info@prothom-alo.info

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা বা ছবি অনুমতি ছাড়া নকল করা বা অন্য কোথাও প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বেআইনি